কুয়াশার রঙ্

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

ভয়ানক বর্ষা। ক'দিন সমানভাবে চলিয়াছে, বিরাম বিশ্রাম নাই। প্রতুল মেসের বাসায় নিজের সিটটিতে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় বা বাহির হইবে? যাইবার উপায় নাই কোনদিকে, ছাদ চুঁইয়া ঘরে জল পড়িতেছে—সকাল হইতে বিছানাটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে সরাইয়াই বা কতক্ষণ পারা যায়?সন্ধ্যার সময় আরও জোর বর্ষা নামিল। চারিদিক ধোঁয়াকার হইয়া উঠিল, বৃষ্টির জলের কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে গ্যাসের আলোগুলো রাস্তার ধারে ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে।

প্রতুল একটাবিড়ি ধরাইল। সকাল হইতে এক বান্ডিল বিড়ি উঠিয়া গিয়াছে—বসিয়া বসিয়া বিড়ি খাওয়া ছাড়া সময় কাটাইবার উপায় কই? সিগারেট কিনিবার পয়সা নাই। এই সময়টা সিগারেট খাইয়া কাটাইতে হইলে দুই বাক্স ক্যাভেন্ডারনেভিকাট সিগারেট লাগিত।

প্রতুলের হঠাৎ মনে পড়িল, এবেলা এখনও চা খাওয়া হয় নাই। মেসের চাকরকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় দুয়ারে কে ঘা দিল। হয়তো হরিশ চাকরের মনে পড়িয়াছে তাহার ঘরে চা দেওয়া হয় নাই। দুয়ার খুলিয়া প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—এই যে প্রতুলদা, ভাল আছেন? নমস্কার। এলাম আপনার এখানেই—

একটি ত্রিশ বত্রিশ বছরের লোক, গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের জুতা, হাতে একটা ছোট টিনের সুটকেস, সঙ্গে একটি বছর নয় দশের ছোট ছেলে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ছাতি হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে—ভিজা জুতায় ঘরের দুয়ারের সামনের মেঝেটাতে জলে দাগ পড়িল, খোলা দরজা দিয়া ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

—আয় রে খোকা, যা, গিয়ে বোস গে যা—তোর জ্যাঠামশায়, প্রণাম কর। দাঁড়া, পা-টা মুছে দিই গামছা দিয়ে—যা—

প্রতুল তখনও ঠিক করিতে পারে নাই লোকটা কে, এমন দুর্যোগের দিনে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। দেশের লোক, গ্রামের লোক তো নয়—কোথায় ইহাকে সে দেখিয়াছে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, এ সেই শশধর, নাথপুরের শশধর গাঙ্গুলী। এত বড় হইয়া উঠিয়াছে সেই আঠারো উনিশ বছরের ছোকরা! আর বাল্যেরও সেই চমৎকার চেহারা এত খারাপ হইয়া উঠিল কিভাবে?

—চিনতে পেরেছেন প্রতুলদা?

—হ্যাঁ, এসো বসো, ও কতকাল পরে দেখা, তা তুমি জানলে কি করে এখানে আমি আছি? ভাল আছ বেশ?এটি কে—ছেলে? বেশ, বেশ।

শশধর রাঙা দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, তা হবে না? সে আজ কত বছরের কথা বলুন তো? আজ বারো তেরো কি চৌদ্দ বছরের কথা হয়ে গেল যে! আপনার ঠিকানা নিলুম জীবন ভটচায্যির কাছ থেকে। জীবন ভটচাযকে মনে পড়ছে না? সেই যে জীবনদা, আমাদের লাইব্রেরির সেক্রেটারি ছিল।

—কিন্তু জীবনবাবুই বা আমার ঠিকানা জানলেন কি করে—তার সঙ্গেও তো বারো তেরো বছর দেখা নেই—যতদিন নাথপুর ছেড়েছি ততদিন তাঁর সঙ্গেও—

—জীবনদার শালার এক বন্ধু আপনারও বন্ধু—রাধিকাবাবু, চিনতে পেরেছেন এবার? সেখানে জীবনদা শুনেছে—আপনি তো আমাদের খবর রাখেন না—আমরা আপনার রাখি। এই, স্থির হয়ে বোস্ খোকা—এক কাপ চা খাওয়ান না দাদা, বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সঙ্গের ছোট ছেলেটি অমনি বলিতে শুরু করিল, খিদে পেয়েছে, বাবা—আমার খিদে পেয়েছে।

তাহার বাবা ধমক দিয়া বলিল—থাম, ছোঁড়ার অমনি খিদে খিদে শুরু হল, থামনা,খেইচিস্ তো দুপুরবেলা—

প্রতুল বলিল—আহা, ওকে ধমকাচ্চ কেন, ছেলেমানুষের খিদে তো পেতেই পারে! দাঁড়াও খোকা, আমি খাবার আনাচ্চি।

চা ও জলযোগের পর্ব মিটিয়া গেলে প্রতুল বলিল—তারপর শশধর, এখন হচ্ছে কি?

শশধর বলিল—করবো আর কি! রামজীবনপুরের ইউ পি স্কুলের হেডপণ্ডিত। আজ দু দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলাম, একটু কাজ আছে। ভাল কথা প্রতুলদা, এখানে একটু থাকবার জায়গা হবে?

প্রতুল বলিল—হাঁ হাঁ, তার আর কি। থাকো না। জায়গা তো যথেষ্টই রয়েচে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের খাওয়ার কথা রাত্রে।

আজ প্রায় বারো তেরো বছর আগে প্রতুল নাথপুর গ্রামের মিউনিসিপ্যাল অফিসে কেরানীর চাকুরি লইয়া যায়। নাথপুর নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, আশপাশের চার-পাঁচখানি ছোট বড় গ্রাম লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি—ইলেকশন লইয়া দলাদলি মারামারি পর্যন্ত হইত। লাইব্রেরি ছিল, ডাক্তারখানা ছিল, হাই স্কুল ছিল, একটা পুলিশের ফাঁড়ি পর্যন্ত ছিল।

একদিন নিজের ক্ষুদ্র বাসাটিতে বসিয়া আছি একা, একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি বুঝি নতুন এসেছেন আমাদের গাঁয়ে?

—হ্যাঁ। এসো বসো। তোমার নাম কি?

—আমার নাম শশধর। আপনার সাথে আলাপ করতে এলুম—একলাটি বসে থাকেন।

—এসো এসো, ভালই। তুমি স্কুলে পড় বুঝি?

শশধর পরিচয় দিল।

না, সে স্কুলে পড়ে না। অবস্থা ভাল না, স্কুলে কে পড়াইবে? তাহা ছাড়া সংসারে বাবা নাই, তাহারই ঘাড়ে সংসার। মা, দুই বোন, তিনটি ছোট ছোট ভাই, স্ত্রী।

প্রতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি বিয়ে করেচ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওবছর বিয়ে হয়ে গিয়েচে।

ছেলেটি দেখিতে খুব সুশ্রী, সুপুরুষ। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াটা আশ্চর্য নয় বটে।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে ছেলেটি সেদিন চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে সে প্রায়ই আসিত। এ গ্রামে প্রতুল নতুন আসিয়াছে, বিশেষ কাহারও সহিত পরিচয় নাই, এ অবস্থায় একজন তরুণ বন্ধু লাভ করিয়া প্রতুলও খুশি হইল। সময় কাটাইবার একটা উপায় হইল। সন্ধ্যাবেলাটা দুজনের গল্পগুজবে কাটিয়া যাইত।

একদিন শশধর প্রতুলকে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিল। শশধরের মা তাকে ছেলের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন, শশধরের বোন কণা তাকে প্রথম দিনেই 'প্রতুলদা' বলিয়া ডাকিল—এই নির্বান্ধব পল্লীগ্রামে ইহাদের স্নেহসেবা প্রতুলের বড় ভাল লাগিল সেদিন।

ইহার পর অফিস হইতে প্রতুল নিজের বাসায় ফিরিতে না ফিরিতে শশধর প্রতুলকে ডাকিয়া নিজের বাড়িতে প্রায়ই লইয়া যায়—প্রায়ই বৈকালিক চা-পানের ও জলযোগের ব্যবস্থা সেখানেই হইয়া থাকে।

দিনকতক যাইবার পরে প্রতুল ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। শশধরদের সাংসারিক ব্যবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়, রোজ রোজ তাহার জলযোগের জন্য উহাদের খরচ করাইতে প্রতুলের মন সায় দিল না। সে খাওয়া বন্ধ করিল। অবশ্য মুখে সোজাসুজি কোনো কিছু বলিতে পারা সম্ভব ছিল না—তবে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলে ওজর আপত্তির অভাব হয় না।

একদিন শশধর আসিয়া বলিল—আজ যেতেই হবে প্রতুলদা—কণা বলেছে তোমাকে নিয়ে না গেলে সে ভয়ানক রাগ করবে আমার ওপর।

প্রতুল আশ্চর্য হইয়া বলিল—কণা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কণা—আমার ছোট বোন। ভুলে গেলেন নাকি? চলুন আজ। প্রতুলের মনে বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই হইল। কণার বয়েস পনেরো ষোল—রং ফর্সা, বেশ সুশ্রী মেয়ে। কথাবার্তা বলে চমৎকার—পাড়াগাঁয়ের তুলনায় লেখাপড়াও জানে ভাল। তাহার সম্বন্ধে কণা আগ্রহ দেখাইয়াছে কথাটা শুনিতে খুব ভাল।

কণা সেদিন প্রতুলের কাছে কাছেই রহিল। কয়দিন না দেখাশোনার পরে দুজনেরই দুজনকে যেন বেশি করিয়া ভাল লাগিতেছে। ফিরিবার সময় প্রতুলের মনে হইল, কণাকে আজ যেন তাহার অত্যন্ত আপন জন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন?

নির্জন বাসায় ফিরিয়া কথাটা সে ভাবিল। কণা মেয়েটি ভাল, সত্যই বুদ্ধিমতী,সেবাপরায়ণা। তাহাদেরই পালটি ঘর। আহা, এই জন্যই কি শশধরের এ তাগাদা তাহাকে ঘন ঘন বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য?

কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও তাহার মনে না আসিয়া পারিল না, তাই কণার অত গায়ে পড়িয়া আলাপ করার ঝোঁক তার সঙ্গে!

প্রতুল আবার শশধরদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল।

শশধর আসিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিতে আদৌ বিলম্ব করিল না। এবার কিন্তু প্রতুল অত সহজে ভুলিল না। তাহার মনে দ্বন্দ্ব লাগিয়াছে। কণা তাহাকে সত্যই ভালবাসে, না তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য ইহা তাহার একটি ছলনা মাত্র?কণার মা কিজন্য তাহাকে অত আদর করিয়া থাকেন বা শশধর তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতে অত আগ্রহ দেখায়—ইহার কারণ প্রতুলের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গরিবের মেয়ে, বিবাহ দিবার সঙ্গতি নাই উপযুক্ত পাত্রে—সে হিসাবে প্রতুল পাত্র ভালই, ত্রিশ টাকা মাহিনা পায় অফিসে, বয়স কম, দেখিতে শুনিতেও এ পর্যন্ত তো প্রতুলকে কেহ খারাপ বলে নাই।

ইহাদের সকল স্নেহ ভালবাসা বা আগ্রহের মধ্যে একটি গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির সন্ধান জানিয়া প্রতুলের মন ইহাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র মাস। সাত আট দিন বেশ ঝলমলে শরতের রৌদ্র—খালের ধারে কাশফুল ফুটিয়াছে, জল কাদা শুকাইয়া আসিতেছে। পূজার ছুটির আর বেশি দেরি নাই, প্রতুল বসিয়া বসিয়া সেই কথা ভাবিতেছিল—মিউনিসিপ্যাল অফিসে বারো দিন ছুটি।

এই সময় একদিন কাহার মুখে প্রতুল শুনিল শশধরের বাড়িতে বড় বিপদ। শশধরের মা মৃত্যুশয্যায়। শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শশধর এদিকে অনেক দিন আসে নাই তা নয়, প্রতুল উহাদের বাড়ি না গেলেও সে এখানে প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকে, চা খায়, গল্পগুজব করে। কই, মায়ের এমন অসুখের কথা তো শশধর বলে নাই?

প্রতুল শশধরদের বাড়ি গেল। এমন বিপদের সময় না আসিয়া চুপ করিয়া থাকা—সেটা ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব উভয়েরই বিরুদ্ধে। প্রতুলের কড়া নাড়ার শব্দে কণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রতুলের মনে হইল কণা তাহাকে দরজায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। প্রতুলই আগে কথা কহিল। বলিল, মা কেমন আছেন?

—আসুন বাড়ির মধ্যে। দাদা নেই বাড়িতে, ডাক্তার ডাকতে গিয়েছে। অবস্থা ভাল না।

—চল চল, দেখি গিয়ে। আমি কিছুই জানিনে কণা অসুখের কথা, শশধর ক'দিন আমার ওখানে যায়নি। তবে মাঝে যা গিয়েছিল, তখন কিছু বলে নি।

—বলবে কি, মার অসুখ আজ সবে পাঁচ দিন হয়েছে তো। পরশু রাত্তির থেকেবাড়াবাড়ি যাচ্ছে। এর আগে এমন তো হয় নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেটা প্রতুলের চোখে সর্বপ্রথম পড়িল, সেটি ইহাদের দারিদ্র্যের কুশ্রী ও মলিন রূপ। সে নিজেও বড়লোকের ছেলে নয়, কিন্তু তবুও তাহাদের বাড়িতে গৃহস্থালীর যে শ্রীছাঁদ আছে, এখানে তার সিকিও নাই।

কণা বলিল, এতকাল আসেন নি কেন এদিকে? আমাদের তো ভুলেই গিয়েছেন।

প্রতুলের মনে কষ্ট হইল। কণার ক্লান্ত, উদ্বেগপূর্ণ এবং ঈষৎ বিষণ্ণ চোখ দুটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে বড় নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে এতদিন এখানে নাআসিয়া। কণা বড় ভাল মেয়ে, যতক্ষণ প্রতুল তাহাদের বাড়ি রহিল ততক্ষণের মধ্যেই প্রতুল জানিতে পারিল কণার কি কর্তব্যজ্ঞান, রুগ্‌ণ মায়ের কি সেবাটাই করিতেছে কণা। এত দুঃখে উদ্বেগেও কণার সুন্দর রূপ ম্লান হয় নাই। অনেক মেয়েকে সে দেখিয়াছে—সাজিলে গুজিলে সুশ্রী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মলিন কাপড় পরিয়া থাকিলে বা চুল না বাঁধা থাকিলে কিংবা হয়তো সদ্য ঘুম হইতে ওঠা অবস্থায় দেখিলে বড় খারাপ দেখায়।

কণার রূপের মধ্যে একটা কিছু আছে যাহাতে কোনো অবস্থাতেই খারাপ দেখায় না। এত অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ, উদ্বেগ, পরিশ্রমের মধ্যেও কণা তেমনই ফুটন্ত ফুলটির মত তাজা, তেমনই লাবণ্য ওর সুকুমার মুখে।

কণার সম্বন্ধে এই একটি মূল্যবান সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রতুল আনন্দিত ও বিস্মিত দুই-ই হইল।

ইহার পর প্রতুল কয়দিনই কণাদের বাড়ি নিয়মিত যাইতে লাগিল—রোগিণীর সেবায় সেও কণাকে সাহায্য করিত—স্টোভ জ্বালা, জল গরম করা, বিছানার চাদর বদলানোর সময় রোগিণীকে বিছানার একপাশে সরানো, ডালিম বেদানার দানা ছাড়ানো। পঞ্চম দিনের প্রাতঃকালে কণার মা যখন ইহলোকের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন তখন সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সে যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দাহকার্যের খরচপত্র নিজ হইতে দিল, কারণ শশধর একেবারে কপর্দকশূন্য সেদিন। নিজে শ্মশানে গিয়া শেষ পর্যন্ত রহিল। আবার সকলের সঙ্গে সেখান হইতে কণাদের বাড়ি ফিরিয়া আগুন তাপিল এবং নিমের পাতা দাঁতে কাটিল।

কণা আজকাল প্রতুলের দিকেও বড় টানে, তাহার সুখ দুঃখ, সে রাত্রে ঘুমাইল কিনা, তাহাকে চা ঠিক সময়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু না হোক এক মুঠা মুড়িও তেল নুন মাখিয়া দেওয়া—এসব দিকে কণার সতর্ক দৃষ্টি—এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও—ইহাও প্রতুলের মনে বড় আনন্দ দিয়াছে কয়দিন।

শ্রাদ্ধের আগের দিন প্রতুল শশধরকে নিজের মাহিনা হইতে কুড়িটি টাকা দিয়া তাহাকে কি করিতে হইবে না হইবে পরামর্শ দিল, জিনিসপত্র ও লোকজন খাওয়ানোর ফর্দ ধরিল। সামান্য তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হইবে—শ্রাদ্ধের দিন বারোটি ব্রাহ্মণ এবং নিয়মভঙ্গের দিন জন পনেরো জ্ঞাতিকুটুম্ব খাইবে। এসব কথা কণাদের বাড়ি বসিয়াইহইতেছিল—পরামর্শান্তে প্রতুলকে বসাইয়া রাখিয়া শশধর কোথায় বাহির হইয়া গেল। প্রতুলের বসিয়া থাকিবার কারণ সে এখনও বৈকালিক চা পান করে নাই, না খাইয়া গেলে কণা চটিয়া যাইবে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, প্রতুল কণার হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া বলিল—বসো কণা। কালকার সব জোগাড় করে রাখো—ফর্দ দিয়েছেন নবীন ভটচায্যি। সন্ধ্যের পর একবার দেখে নিয়ো সেখানা—শশধর কেনাকাটা করতে গিয়েছে, যদি কিছু বাদ পড়ে, আনিয়ে নিয়ো।

—আপনি টাকা দিলেন?

—আমি? হাঁ-তা ইয়ে—

—কত টাকা দিলেন?

—সে কথায় দরকার?সে এমন কিছু নয়—তা ছাড়া ধার—শশধর আবার আমায়—

—দাদা আবার আপনাকে ছাই দেবে। আপনাকে কথাটা বলবো ভেবেচি। কেন আপনি আমাদের পেছনে এমন করে খরচ করবেন? রোগের সময় টাকা দিয়েছেন—আবার কাজের সময় দেবেন! আপনি কি এমন ন'শো পঞ্চাশ টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন শুনি? মাইনে তো পান ত্রিশটি টাকা। আপনার নিজের বাবা মা ভাই-বোন

রয়েছে, তাদের কি দেবেন? নিজে কি খাবেন? আপনাকে বলি শুনুন। দাদা বেকার বসে আছে, আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা কখনও আর উপুড় হাত করবে না। ওর ওই স্বভাব। আপনি আর এক পয়সা দেবেন না বলে দিচ্ছি। মায়ের কাজ হোক না হোক আপনার কি? আপনি কেন দিতে যাবেন?

প্রতুল বিস্মিত দৃষ্টিতে কণার মুখের দিকে চাহিল। কণার মুখে একটি সবল তেজস্বী সারল্য ...সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী ওর ডাগর চোখ দুটি, যা খোশামোদ করিতে বা ছলনা করিতে শেখে নাই, আজও প্রতুলের মনে হইল।

কিন্তু কণা আজ এ কি নতুন ধরনের কথা বলিল?ভারি আশ্চর্য কথা। এতদিন কণাকে চিনিতে পারে নাই সে, আজ চিনিল বটে। শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। কণা সাধারণ মেয়ে নয়।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়া গেল। প্রতুল নিয়মিত উহাদের বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিল। কণার সেবায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সে যত্ন ও সেবায় এতটুকু খুঁত কোনোদিন প্রতুলের চোখে পড়িল না আজও। মায়ের শোক খানিকটা প্রশমিত হইবার পরে কণা আরও সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে এখন, পরিস্ফুট যৌবন-শ্রী তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

প্রতুল ইতিমধ্যে মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে কি করিয়া কথাটা এইবার সে পাড়িবে। কথাবার্তা পাকা না হয় রহিল, অশৌচ কাটিয়া গেলে বিবাহ হইতে বাধা কি! পরের বাড়ির তরুণী পূর্ণযৌবন মেয়ের সহিত এ ভাবে মেলামেশা উচিত হইতেছে না।—একটা পাকাপাকি কথা হওয়া ভাল। বৈকালে প্রতুল কণাদের বাড়ি গেল।

কণা আসিয়া বলিল, ওইরে বাস! আমি বলেচি কি না বলেচি, প্রতুলদা তো এল বলে। দুধ নেই চা করবার, ওবেলা পিন্টু দুধের কড়া আল্‌গা করে দিয়েচে, আর সব দুধখানি উপুড় করে রেখে দিয়েচে বেড়ালে।

—বসো কণা এখানে। চা হবে এখন, তার জন্যে কিছু নয়।

কণা এখন মাতৃহীন ছোট ভাইবোনের মায়ের স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, সংসারে সেই এখন কর্ত্রী, প্রতুল তা জানে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কর্ত্রীটি মাঝে মাঝে কি রকমে ফাঁদে পড়িয়া যায় পয়সা কড়ির অভাবে তাহাও প্রতুল দেখিয়াছে। কণা তাহাকে কিছু বলে না— কোনোদিন না—কিন্তু সে নানা রকমে টের পায়, যেমন আজই পাইল।

কণা কি কাজে একটু উঠিয়া গিয়াছে, প্রতুল কণার ছোট্ট ভাই বিনুকে ডাকিয়া বলিল, কি খেয়েচ খোকাবাবু?

—ভাত খেয়েচি।

—এখন কি খেয়েচ?

—আর কিছু নেই, ভাত নেই। দিদি খায় নি।

তখন সেখানে কণার ছোট বোন এগারো বছরের পিন্টু আসিল। প্রতুল বলিল, কণা খায় নি কেন?

পিন্টু বলিল, ভাত ছিল না। ওবেলা চাল ধার করে নিয়ে এল দিদি ওই সরকারদের বাড়ি থেকে। দাদা কাল কোথায় গিয়েচে, আজও তো ফিরলো না। মহেশ চক্কত্তির দোকানে টাকা পাবে বলে চাল ডাল দেয় না আজকাল, দিদি এখন কোথায় পাবে, কোন্ দিকে যাবে?

প্রতুল অনেক কথা ভাবিল। কণা সংসার চালাইতে পারে না টাকার অভাবে, সে নিজে যদি বাহির হইতে দু'দশ টাকা সাহায্য করে সেটা যেন ভিক্ষা দেওয়ার মত দেখায়। সে টাকা হাত পাতিয়া লওয়ায় কণার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কণাকে সে-অপমানের মধ্যে টানিয়া আনিতে তাহার মন সরে না, অথচ এ রকম কষ্ট করিয়াই-বা কণা কতদিন বাঁচিবে?

সবদিকের মীমাংসা করিতে হইলে বিবাহের কথাটা পাড়িতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আজই সে কণার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করিবে আগে—তাহার পরে শশধরকে জানাইলেই চলিবে এখন। শশধরটা মানুষ নয়, সে ইতিমধ্যে বেশ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল—একটু দেরি হয়ে গেল প্রতুলদা, দুধ ছিল না একেবারে। আনলাম রায় কাকাদের বাড়ি থেকে। দেখুন তো চা-টা খেয়ে কেমন হয়েচে?

প্রতুল বলিল—ব্যস্ত হয়ে ঘুরচ কোথায় কণা? বসো এখানে, কথা আছে।

শীতকালের বিকাল, কণাদের বাড়ির চারিপাশে বনজঙ্গলে বনমৌরী লতায় ফুল ফুটিয়াছে—বেশ একটা উগ্র সুগন্ধে অপরাহ্ণের শীতল বাতাস ভরপুর। ভাঙা ইটেরপাঁচিলের গায়ে রাঙা রোদ পড়িয়া কণাদের পুরানো পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রাচীনত্ব ও দারিদ্র্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

কণা বসিল, প্রতুলের মুখের দিকে আগ্রহের সহিত চাহিয়া বলিল, কি প্রতুলদা?

—তোমাকেই কথাটা বলি, কিছু মনে কোরো না কণা। অনেকদিন থেকে কথাটা আমার মনে রয়েচে—বলি বলি করে বলা ঘটে উঠচে না। তুমি আমায় বিয়ে করবে কণা? আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে মনে করবো, যদি—

কণা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ দুজনের কেহই কথা বলিল না। তারপরে কণা ধীরে ধীরে অনেকটা চাপা সুরে বলিল, সে হয় না, প্রতুলদা।

প্রতুল বিস্মিত হইল। কণার এ উত্তর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাহার কাছে। বলিল, হয় না কণা?

কণা মাটির দিকে চোখ রাখিয়া পূর্ববৎ নিম্নসুরে বলিল, হয় না প্রতুলদা। কারণ আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে কথা বলবো না। বিয়ে হতে পারে না।

কেন? কণা কি অন্য কোনো যুবককে ভালবাসে? কই, আর কোনো যুবককে তো প্রতুল কোনোদিন উহাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করিতে দেখে নাই? ব্যাপার কি?

—কারণটা জানতে পারলে বড় ভাল হতো, কণা। খুব বেশি বাধা কিছু আছেকি?

—হাঁ।

—কারণটা বলবে?

—আপনি কিছুই জানেন না? দাদা কিছু বলেনি আপনাকে?

প্রতুল আরও বিস্মিত হইল। কি জানিবে সে! শশধরই বা তাহাকে কি বলিবে! অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে সে বলিল—না কণা, তুমি কি বলচো আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে। শশধর কি বলবে আমায়?

—আমি বিধবা।

—তুমি!

—হ্যাঁ, আট বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়—তেরো বছর বয়সে—এই পাঁচ বছর হলো।

প্রতুলের মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল যেন। সর্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কণা বিধবা! কণার বিবাহ হইয়াছিল আট বছর বয়সে! অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! আর সে কত আকাশ-কুসুম না রচনা করিয়াছে মনে মনে এই কণাকে লইয়া...ইহাদের প্রতি মনে মনে কত অবিচার করিয়াছে তাহাকে জামাই করিবার উদ্দেশ্য প্রতি-আরোপ করিয়া! গ্লানি ও অনুতাপে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

—কিন্তু কণা, একথা তো আমি কিছুই জানিনে। আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

—আমার কিন্তু ধারণা ছিল যে, আপনি জানেন, দাদা বলেছে আপনাকে। আমিও অবাক হয়ে গেছি এ কথা শুনে।

—একটা কথা বলবো ! বিধবার পুনর্বিবাহ তো হচ্ছে সমাজে।

—প্রতুলদা ওসব কথা থাক্। যা হয় না যেখানে, সেখানে সে কথা তোলা মিথ্যে মিথ্যে কেন?

—না, আমার কথার উত্তর দাও কণা, আমি অমন ধরনের কথা শুনবো না তোমার মুখে; তোমায় সুখী করার দিকে আমার লক্ষ্য। সেজন্যে সংস্কার এবং সমাজ আমি অনায়াসেই ঠেলবো।

কণার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে মুখ নীচু করিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—আপনার পায়ে পড়ি প্রতুলদা—

প্রতুল আর কিছু বলিল না। পরদিন অফিসে আসিয়াই সে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া দিল এক মাসের নোটিশে। এখানে আর থাকিবে না, থাকিয়া লাভ নাই।

এই এক মাসের মধ্যে সে কণাদের বাড়ি গেল প্রায় প্রত্যেকদিনই কিন্তু চাকুরিতে নোটিশ দেওয়ার কথা কাহাকেও বলিল না। বিবাহ সম্বন্ধে কণার সাথে আর কোনো কথাও সে বলে নাই, যদিও কণা আগের মতই তাহার কাছে নিঃসঙ্কোচে আসে, বসে, কথাবার্তা কয়।

যাইবার পূর্বে সে কণাদের বাড়ি গেল। অন্যান্য কথাবার্তার পর সে বলিল, কণা, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি কাল।

কণা আশ্চর্য হইয়া প্রতুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—চলে যাবেন? কেন?

—চাকুরি ছেড়ে দিচ্চি।

—সে কি কথা!

—কথা ঠিকই তাই। কাল যাচ্চি।

—সত্যি?

—সত্যি। মিথ্যে বলে লাভ কি?

—সেকথা তো একদিনও বলেন নি—

—না বলিনি। বলেই বা লাভ কি? যেতেই যখন হবে।

—কেন, এখানে আপনার অসুবিধা কি হচ্ছিল? ভাল চাকুরি পেয়েছেন বুঝি কোথাও?

—কোথাও না।

কণা চুপ করিয়া রহিল। প্রতুলও তাই।

খানিক পরে কণা বলিল, যাবেন তা জানতুম। বিদেশী লোক আপনি—আপনাকে তো ধরে রাখা যাবে না। আমাদের কথা আপনি শুনবেনই বা কেন?

—অনেক জ্বালাতন করেচি, কিছু মনে কোরো না কণা।

কণা চুপ করিয়া রহিল।

এই পর্যন্ত সেদিন কণার সঙ্গে কথাবার্তা। পরদিন আর একবার কণাদের বাড়ি যাইবার কথা ভাবিয়াও প্রতুলের যাওয়া ঘটিল না, দুপুরের ট্রেনে প্রতুল চলিয়া আসিল।

সারাপথ কেবল কণার কথা মনে হইল প্রতুলের। সেই অভাব অনটনের সংসারে চিরকাল কাটাইতে হইবে তাহাকে। গরিবের ঘরের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে, দাদার সংসার ছাড়া আর উপায় নাই। কণার জীবন অন্ধকার, কোনো আলো নাই কোনোদিক হইতে। প্রতুলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন টন্‌টন্ করিতেছে। কণাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছে সে!

পরক্ষণেই ভাবিল, কি মুশকিল! কণা রয়েচে তার বাপের ভিটেতে ভাইবোনের কাছে, দাদার কাছে। আমার সঙ্গে তার কি?

মাস পাঁচ ছয় পরে, সেই ফাল্গুন মাসেই মায়ের পীড়াপীড়িতে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

প্রতুলের শ্বশুরের দু-তিনটি ছোট বড় কলিয়ারি ছিল। কিন্তু কলিয়ারিগুলির অবস্থা ছিল খারাপ। চুরি হইত, নির্ভরযোগ্য ম্যানেজারের অভাবে কলিয়ারিগুলি লোকসানীমহল হইয়া পড়িয়া থাকিত।

প্রতুলের শ্বশুর একদিন প্রস্তাব করিলেন—সে অফিসে পরের চাকুরি না করিয়া যদি কলিয়ারিগুলির তত্ত্বাবধান করে, তবে অফিসে যে বেতন পাইতেছে তাহা তো পাইবেই, উপরন্তু ভবিষ্যতে একটা উন্নতির আশা থাকে শ্বশুর-জামাই উভয়েরই। প্রতুল শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজি হইল। আরও বছর দুই পরে কলিয়ারির অবস্থা সত্যই ফিরিল প্রতুলের কর্মদক্ষতায়। প্রতুল আসানসোলের রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে বুদ্ধচক্ কলিয়ারিতে সাজানো বাংলোতে স্ত্রী-পুত্র (ইতিমধ্যে তাহার একটি ছেলে হইয়াছিল) লইয়া বাস করে—একটু স্টাইলের উপরই থাকে, না থাকিলে চলে না, কাজের খাতিরেই থাকিতে হয় নাকি।

কি জানি কেন এখানে আসিয়া কণার কথা তাহার বড়ই মনে পড়িতে লাগিল। আজ তাহার এই সাজানো বাংলো, সুখ ঐশ্বর্য—ইহাদের ভাগ কণা কিছুই পাইল না। সেই সুদূর পাড়াগাঁয়ে দারিদ্র্য ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে ভাঙা পুরোনো ইটের পুরোনো কোঠাবাড়ি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল!

প্রতুলের মনটা যেন হা-হা করিয়া ওঠে। সে বুঝিল, এখনও কণার কথা তাহার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাই তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া প্রতুলের পক্ষে সহজ নয়। প্রতুলের স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে, বাল্যকাল হইতে সে সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নতুন জিনিস দেখাইয়া লাভ কি? তেলা মাথায় তেল দেওয়া। বরং যে চিরবঞ্চিতা—জীবন যাহাকে কিছু দেয় নাই—তাহাকে যদি আজ সে— কেন এমন হয় জীবনে কে বলিবে?

যে পাইয়া আসিতেছে সে-ই বরাবর পায়, যে. পায় না সে কখনই পায় না। যাহাকে খাওয়াইয়া সুখ পরাইয়া সুখ, দেখিয়া দেখাইয়া সুখ—তাহাকে খাওয়ানো যায় না, পরানো যায় না, দেখানোও যায় না।

কেন এমন হয়?

এ সব চার পাঁচ বছর আগের কথা।

আজ কয়েক দিন হইল প্রতুল কলিকাতায় আসিয়াছে চাকুরির খোঁজে।

কলিয়ারি আছে কিন্তু প্রতুলের স্ত্রী নাই। পুনর্মূষিকের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবার ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে এই যে, গত বৎসর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই শ্বশুরের কলিয়ারিতে থাকা প্রতুলের ভাল মনে হইল না এবং তারপরে দেখা গেল প্রতুলের শ্বশুরেরও তাহা ক্রমশ ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং আজ কয়েকদিন হইল প্রতুল তাহার ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া এই পরিচিত মেসটিতে উঠিয়াছে এবং চাকুরির সন্ধানে আছে।

এই সেই শশধর। কণার ভাই। এতকাল পরে হঠাৎ এভাবে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল! কিছুক্ষণ বসিয়া শশধর চা খাইয়া সুস্থ হইবার পরে প্রতুল বলিল, তারপরে কি মনে করে? কেমন আছ?

শশধর বলিল, ভালই আছি। আপনি এখানে আছেন তা শুনলুম জীবনদার কাছে। আপনি নাকি চাকুরি খুঁজচেন? সেই জন্যেই আমার এখানে আসা। আপনার সব কথাই শুনেছি।

কি ব্যাপার? চাকুরি সন্ধানে আছে নাকি?

আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যাল অফিসের সেই কেরানীর পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি গেলে ওরা লুফে নেবে এখুনি। কিশোরী চাটুজ্যে এখন চেয়ারম্যান, আপনাকে বড় ভালবাসতো, আমাদের আপনার লোক। দিন একখানা দরখাস্ত করে। আমি লিখলে একবার গিয়ে ইন্টারভিউ করে আসবেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে।

আবার সেই নাথপুর! সেই মিউনিসিপ্যাল অফিসের ত্রিশ টাকা বেতনের কেরানীর পদ! তাহাই হউক। প্রতুল দরখাস্ত লিখিয়া পরদিন সকালে শশধরের হাতে দিল। চাকরি না করিলে চলিবে না। ছোট ছেলেটি

লইয়া ত্রিশ টাকায় তাহার খুব চলিয়া যাইবে। তাহার বাবা মা জীবিত বটে, কিন্তু ছেলের রোজগারের উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয় না।

দিন পনেরো পরে শশধর লিখিল—চাকুরির সব ঠিক, একবার আসিয়া চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করা দরকার। প্রতুল ছেলেকে লইয়া নাথপুরে গেল। দশ বৎসর আসে নাই এদিকে, অথচ যেন মনে হইতেছে কাল এ গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। কণার কথা সে শশধরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কোথায় যেন বাধিয়াছিল—বহু চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। আজ স্টেশনে নামিতেই কণার কথা প্রথমেই মনে পড়িল। কণা যেখানে থাকে, সেখানেই সে থাকিবে জীবনের বাকি কয়টা দিন।

বেলা প্রায় একটা, শশধর স্টেশনে ছিল। বলিল—প্রতুলদা, আপনার সেই পুরানো বাসা ভাড়া করে রেখেছি। কোন অসুবিধে হবে না। আর কণা বলে দিয়েছেআজ ওখানে খাবেন। চাকুরি হয়ে যাবে এখন, সব বলা আছে।

প্রতুল বলিল—এবেলা খাব না। খোকাকে বরং নিয়ে যাও কণার কাছে। আমি অফিসের পরে যাব। আমরা দুজনেই সকালে খেয়ে গাড়িতে চড়েচি। বিকালের দিকে চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরে প্রতুল শশধরদের বাড়ি গেল। প্রথমেই কণা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—প্রতুলদা, এতদিন পরে মনে পড়লো? তারপর সে পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল।

প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কণা কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যময়ী কিশোরী? এ কণাকে সে চেনে না। কণা পূর্বাপেক্ষা শীর্ণা হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য অন্তর্হিত হইয়াছে অনেককাল বলিয়াই মনে হয়—যদিও বর্তমানে সাতাশ-আটাশ বছরের বেশি বয়স নয় কণার। মুখের কোথাও পূর্ব লাবণ্যের চিহ্ন আছে কিনা প্রতুল বিশেষভাবে খুঁজিয়া দেখিয়াও পাইল না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুল দেখিল কণার উপর তাহার সে ভালবাসা যেন এক মুহূর্তে মন হইতে কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। এ কণা অন্য একজন স্ত্রীলোক—তাহার ভালবাসার পাত্রী, তাহার পরিচিত কণা এ নয়। কাহাকে সে ভালবাসিবে?

কণা অবশ্য খুব আদর-যত্ন করিল। আহারাদির পরে প্রতুলকে পান আনিয়া দিয়া কণা বলিল, কতদিন আসেন নি, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে প্রতুলদা। বসুন আমি আসচি।

প্রতুল ভাবিতেছিল, ভাগ্যে কণার সঙ্গে তাহার বিবাহের সুবিধা বা যোগাযোগ হয় নাই! কি বাঁচিয়াই গিয়াছে সে! ভগবান বাঁচাইয়া দিয়াছেন। উঃ!

দু-চারটি মামুলি কথা বলিয়া প্রতুল ছেলের হাত ধরিয়া উহাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল।

পরদিন সকালে শশধরকে ডাকিয়া বলিল, না ভাই, ছেলেটার শরীর খারাপ হয়েছে কাল রাত্রেই। তোমাদের যা ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলে নিয়ে এখানে চাকুরি পোষাবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে।